১৪

নারী অধিকার

ফস্‌টিনা পেরেরা ও শাহ আফ্রোদিতি পান্না

এ অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে নারী অধিকার প্রতিষ্ঠায় আইন ও নীতিগত যে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে– বিশেষ করে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতির ঘোষণা, নারী নির্যাতন রোধ ও নারী-পুরুষ সমতা এবং রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণের জন্য আইন প্রণয়ন ইত্যাদি বিষয়ে। নারী নির্যাতন মামলার বিচারের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রামে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়েছে, যা নারীর আইনি নিরাপত্তা বিধানের জন্য গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ আইনি ও প্রশাসনিক পদক্ষেপ। নারী অধিকার আন্দোলনকারীরা নাগরিক সমাজের সাথে সম্মিলিতভাবে কীভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যৌন নিপীড়নের বিচারের দাবির আন্দোলনে অংশ নিয়েছে, কীভাবে নারীর সম-অধিকারের বিরোধিতাকারী ধর্মীয় দলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী ভূমিকা পালন করেছে– এ বিষয়েও আলোচনা করা হয়েছে এখানে।

জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতির ঘোষণা এবং প্রতিরোধ

৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবসে সরকারের প্রধান উপদেষ্টা নারী উন্নয়ন নীতি ২০০৮ ঘোষণা করেন। সরকারের এ ঘোষণাকে সাধারণভাবে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ইতিবাচক সাড়া জাগায়। নারীর সম-অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ’৯৭ সালে ঘোষিত প্রথম জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিতে মৌলিক এবং গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলোতে পরিবর্তন ঘটিয়ে সরকার ২০০৪ সালে ‘গোপনে’ নতুন একটি জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি প্রণয়ন করে।

অর্থনৈতিক নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে নারীর সমান অধিকার, সম্পত্তিতে সমান অংশীদারিত্ব, জমি, উত্তরাধিকার, স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তিতে নারীর জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টি করা, সংসদে নারীর জন্য সংরক্ষিত আসনে সরাসরি নির্বাচন অনুষ্ঠানের উদ্যোগ গ্রহণ– এই বিষয়গুলোকে বাদ দিয়ে নারীর সমান অধিকার ও অংশগ্রহণের বিষয়কে সঙ্কোচিত করে আনা হয় ২০০৪ সালের নীতিতে।[১] ২০০৮ সালে ঘোষিত নীতিমালা কয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া ১৯৯৭-এ গৃহীত নীতিমালার অনুরূপ। নতুন সংযোজন হিসেবে এসেছে ৫ মাসের মাতৃত্বকালীন ছুটি (বর্তমান মাতৃত্বকালীন ছুটি ৪ মাসের), বিদেশে শ্রমবাজারে নারীর অধিকতর অংশগ্রহণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পরিবেশ সৃষ্টি, জাতীয় সংসদে এক-তৃতীয়াংশ আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষণ ও সংরক্ষিত আসনে প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচন অনুষ্ঠানের উদ্যোগ নেয়া– এই বিষয়গুলো। ১৯৯৭-এর নীতিতে উত্তরাধিকার এবং জমির ক্ষেত্রে নারীর সমান সুযোগ ও নিয়ন্ত্রণ অধিকারের বিষয়গুলো উল্লেখ থাকলেও ২০০৮ সালের ঘোষিত নীতিমালা থেকে এ বিষয় দুটি বাদ দেয়া হয়। গুরুত্বপূর্ণ এ বিষয়গুলো নীতিমালা থেকে বাদ দেয়ায় নারী অধিকার আন্দোলন কর্মীরা এর তীব্র আপত্তি ও প্রতিবাদ জানায়।

এর ঠিক বিপরীত অবস্থান থেকে ইসলামি দলগুলোও নীতিমালার বিরোধিতায় রাস্তায় নামে। ঘোষিত নারী উন্নয়ন নীতি ২০০৮-কে তারা 'ইসলামবিরোধী' আখ্যা দেয়। এবং উত্তরাধিকার আইনে নারী-পুরুষের সমান অংশীদারিত্বের বিষয়টি নীতিমালায় অন্তর্ভুক্ত না করার জন্য দাবি জানায়। এ প্রেক্ষিতে ১১ মার্চ সরকারের আইন উপদেষ্টা ঘোষণা করেন যে, 'ইসলামবিরোধী' আইন পাসের কোনো ইচ্ছা সরকারের নেই।[২] ২৭ মার্চ, নীতিমালায় 'ইসলামি আইনবিরোধী কিছু আছে কিনা তা চিহ্নিত করতে' এবং এরকম কিছু থাকলে তা নীতিমালা থেকে বাদ দিতে নজিরবিহীনভাবে সরকার ২০ সদস্যবিশিষ্ট একটি পর্যালোচনা কমিটি গঠন করে। কমিটি যখন তার পর্যালোচনার কাজ শুরু করেছে, তখন নারীনীতি বিরোধীরা মসজিদে সমবেত হয়ে রাজপথে সহিংস প্রতিবাদ চালায়। ১১ এপ্রিল শুক্রবার জুমার

১ বিস্তারিত দেখুন : *হিউম্যান রাইটস ইন বাংলাদেশ ২০০৪*, আসক, ঢাকা, ২০০৫, পৃ. ১১৩-১১৪ এবং *হিউম্যান রাইটস ইন বাংলাদেশ ২০০৫*, আসক, ঢাকা, ২০০৬, পৃ. ১৯৮-১৯৯।

২ জিয়তি রহমান, লেসন ফ্রম দি উইমেন ডেভেলপমেন্ট পলিসি ডিবাকল, *ফোরাম*, ভলিউম ৩, ইস্যু ৬, ২০০৮। পাওয়া যাবে: www.thedailystar.net/2008/june/women_development.htm

নামাজ শেষে তারা ঢাকার বায়তুল মোকাররম এলাকায় ইটপাটকেল ছোঁড়াসহ লাঠিসোটা নিয়ে বিক্ষোভ মিছিল বের করে। জরুরি অবস্থা সত্ত্বেও তারা এসব সহিংস কর্মকাণ্ড চালায়। অপরদিকে এর কিছুদিন আগে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের গ্রেফতারের প্রতিবাদে শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করতে গেলে সম্পূর্ণরূপে তা দমন করা হয়। ১৭ এপ্রিল গঠিত পর্যালোচনা কমিটি ঘোষিত নীতিমালায় যেসব ক্ষেত্রে নারী এবং পুরুষের সমান অধিকারের কথা বলা হয়েছে তা পরিবর্তন করে তার স্থলে নারীর জন্য 'ন্যায্য অধিকার' কথাটি অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সুপারিশ করে।[৩] নারী উন্নয়ন নীতিতে মৌলবাদী কয়েকটি ইসলামি দলের বিরোধিতার প্রেক্ষিতে সরকার যে অবস্থান নেয়, তা নিঃসন্দেহে নারীর অগ্রযাত্রার জন্য বিপজ্জনক। ইসলামি দলের বৈঠকে উপস্থিত হয়ে সরকারের আইন উপদেষ্টার 'উত্তরাধিকার বিষয়ে কোনো আইন সংশোধন করার মানসিকতা সরকারের নেই'– এ ধরনের ঘোষণা এবং নীতিমালার সাথে সংশ্লিষ্ট কাউকে অন্তর্ভুক্ত না করে ঘোষিত নীতি পর্যালোচনা কমিটি গঠন করাসহ নারী উন্নয়ন নীতি নিয়ে সরকারের এ ধরনের ভূমিকা[৪] পরে মারাত্মক বিতর্কের জন্ম দেয়।

---

৩ *প্রাগুক্ত।*

৪ শাহ আফ্রোদিতি পান্না, আসক বুলেটিন, মার্চ ২০০৮, পৃ. ২২।

২০০৮ সালে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ

নারীর প্রতি সবধরনের বৈষম্য বিলোপ সনদ (ইউএন-সিডও)

এখন পর্যন্ত জাতিসংঘ ঘোষিত নারীর প্রতি সবধরনের বৈষম্য বিলোপ সনদ সিডওর সনদের ধারা ২ [নারী-পুরুষের মধ্যে সবধরনের বৈষম্য বিলোপ সংক্রান্ত ধারা] এবং ধারা ১৬.১ (গ) [বিবাহ বিচ্ছেদকালে একই অধিকার ও দায়িত্ব সংক্রান্ত ধারা]-এর ব্যাপারে বিধিনিষেধ প্রত্যাহার করে এর পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের ব্যাপারে কোনো পদক্ষেপ নেয়া হয়নি।[৫] ইতিপূর্বে সিডও কমিটির পক্ষ থেকে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি যে প্রস্তাবগুলো দেয়া হয়েছিল তার বাস্তবায়নে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় দেশের নারী অধিকার সংগঠনগুলো উদ্বেগ প্রকাশ করে। কিছু নীতি ও কর্মসূচি গ্রহণ করতে (যেমন– ভিশন স্টেটমেন্টের নবায়ন, যেখানে বাংলাদেশ পুলিশে জেন্ডার পলিসি প্রণয়নের ব্যাপারে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে, বা নভেম্বরে বাংলাদেশ পুলিশের নারী নেটওয়ার্ক চালু করা) দেখা গেলেও এই উদ্যোগগুলো সমন্বিত বা সুশৃঙ্খল না হওয়ায় আন্তর্জাতিক পর্যায়ে গৃহীত দায়িত্ব পালনে রাষ্ট্রের যে বাধ্যবাধকতা তা পূরণ করতে সরকার ব্যর্থ হয়।

---

৫ ‘উইথড্র রিজার্ভেশন টু সিডও : মহিলা পরিষদ আর্জস গভ.’, *দি ডেইলি স্টার*, ২ সেপ্টেম্বর ২০০৮।

পার্বত্য চট্টগ্রামে নারী নির্যাতন দমন আদালত

২৪ ফেব্রুয়ারি দেয়া হাইকোর্টের নির্দেশের প্রেক্ষিতে সরকার অবশেষে পার্বত্য চট্টগ্রামের রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি এবং বান্দরবান এই তিন জেলায় আলাদা আলাদা জেলা আদালতের মাধ্যমে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল স্থাপন করে, যা খুবই ইতিবাচক একটি পদক্ষেপ। বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট) দেশের সব নাগরিকের ন্যায়বিচার পাওয়ার সাংবিধানিক অধিকার নিশ্চিত করার বিষয়ে একটি জনস্বার্থ মামলা করলে কোর্টের নির্দেশের প্রেক্ষিতে সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আদালত স্থাপন করে। এ নির্দেশের বাস্তবায়ন পার্বত্য অঞ্চলের মানুষের আইনি প্রতিকার পাওয়ার সুযোগকে বিস্তৃত করবে।

রাজনীতিতে নারীদের অংশগ্রহণ- প্রার্থী মনোনয়ন

২০০৮ নির্বাচনের বছর হওয়ায় রাজনীতিতে নারীদের অংশগ্রহণের মাত্রা পরীক্ষা করে দেখার একটি ভালো সুযোগ এনে দেয় বছরটি। কাঠামোগত বাধা, নারীর প্রতি সহিংসতা, সাধারণ নিরাপত্তার অভাব এবং চলাফেরায় বিধিনিষেধ ইত্যাদি কারণে সাধারণভাবে রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণ বাধাগ্রস্ত হয়ে থাকে।[৬] নির্বাচনে রাজনৈতিক দলগুলোকে ৩৩ শতাংশ নারী প্রার্থী মনোনয়ন দেয়া বাধ্যতামূলক করে জনপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশে একটি ধারা যোগ করার জন্য নির্বাচন কমিশনের সুপারিশের ব্যাপারে ব্যাপক বিতর্ক দেখা যায়। বাম জোটের ১১টি দল ছাড়া দলে নেতৃস্থানীয় পর্যায়ে নারীদের অভাব রয়েছে বলে অধিকাংশ রাজনৈতিক দলই নির্বাচন কমিশনের সু-পারিশের বিরোধিতা করে।[৭] রাজনৈতিক দলের আলোচনার প্রেক্ষিতে ৬ অক্টোবর উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে নবম সংসদের প্রথম অধিবেশনের ছয় মাসের মধ্যে নির্বাচন কমিশনের কাছে রাজনৈতিক দলগুলো তাদের অনুসমর্থনকৃত গঠনতন্ত্র (নির্দিষ্টসংখ্যক নারী প্রার্থীকে মনোনয়ন দেয়া হবে– এমন একটি ধারা যোগ করা হয়) জমা দেবে এই শর্তে জনপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশের দ্বিতীয় সংশোধনী পাস হয়। তবে পূর্বের নির্বাচনের চেয়ে

---

৬ *‘উইমেন আর ইকুয়্যাল পার্টনার্স ইন পলিটিকস’*, ২৭ অক্টোবর সিরডাপ মিলনায়তনে স্টেপস টুয়ার্ডস ডেভেলপমেন্ট আয়োজিত একটি সেমিনারের প্রতিবেদন।

৭ ‘দলে ৩৩ ভাগ নারী প্রতিনিধি রাখার বিষয়ে ইসির সুপারিশের ওপর আপত্তি প্রত্যাহারের আবেদন’, *জনকণ্ঠ*, ১০ জানুয়ারি ২০০৮; আরও দেখুন : ‘উইমেন’স রাইটস’, *হিউম্যান রাইটস ইন বাংলাদেশ ২০০৭*, আসক, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ৭৬।

রাজনৈতিক দলগুলো এবারের সংসদ নির্বাচনে অধিকসংখ্যক নারী প্রার্থীর মনোনয়ন দিয়েছে। আওয়ামী লীগ মোট ২৫৯[৮] প্রার্থীর মধ্যে ১৯ জন নারী প্রার্থী[৯] (৭.৩৩ শতাংশ), বিএনপি ২৫৬ জনের মধ্যে ১৫ জন (৫.৮৫ শতাংশ), জাতীয় পার্টি ৪৬ জনের মধ্যে তিনজন (৬.৫২ শতাংশ), বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল (বাসদ) ৫৭ জনের মধ্যে একজন (১.৭৫ শতাংশ), বিকল্পধারা ৬২ জনের মধ্যে চারজন (৬.৪২ শতাংশ), জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জেএসডি) ছয়জনের মধ্যে একজন (১৬ শতাংশ), গণফোরাম ৪৫ জনের মধ্যে পাঁচজন (১১.১১ শতাংশ) এবং কমিউনিস্ট পার্টি ৩৭ জনের মধ্যে দু'জন (৫.৪০ শতাংশ) নারী প্রার্থীর মনোনয়ন দিয়েছে।

স্থানীয় সরকারের সব পর্যায়ে ৪০ শতাংশ আসন নারীদের জন্য সংরক্ষণের পূর্ব ঘোষণা থেকে সরকার আকস্মিকভাবে সরে আসে। ২৩ মার্চ উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে নারীদের জন্য ৪০ শতাংশ আসন সংরক্ষণের ধারা সংবলিত সিটি করপোরেশন ও পৌরসভার গঠন এবং কার্যপ্রণালির ওপর দুটি অধ্যাদেশ অনুমোদন করা হয়।[১০] সরকার ঘোষণা করেছিল যে, ইউনিয়ন, উপজেলা এবং জেলা পরিষদের গঠন ও কার্যপ্রণালি সম্পর্কিত আগামীতে যে আইন হতে যাচ্ছে সেখানেও এই ধারা অন্তর্ভুক্ত করার পরিকল্পনা আছে।[১১] কিন্তু ২৪ এপ্রিল উপদেষ্টা পরিষদের বিশেষ বৈঠকে 'ন-ারীদের জন্য ৪০ শতাংশ আসন সংরক্ষণের' ধারা বাদ দিয়ে সিটি করপোরেশন ও পৌরসভার অধ্যাদেশ দুটি পাস হয়। প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর দাবির প্রেক্ষিতে সরকার ধারাগুলো বাদ দিয়েছে বলে জানা যায়।[১২]

সংসদে সংরক্ষিত আসনের ব্যাপারে কোনো পরিবর্তন হয়নি (এর জন্য সংবিধানের ধারায় পরিবর্তন প্রয়োজন)। তবে নির্দিষ্টসংখ্যক নারী প্রার্থীদের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মনোনয়ন দিতে হবে– রাজনৈতিক দলের নিবন্ধনের

৮ সর্বশেষ হালনাগাদ (২৪ ডিসেম্বর ২০০৮), প্রার্থীর সংখ্যা (দল অনুযায়ী), বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন ওয়েবসাইট, ীীী.বপং.মড়া.নফ/উহমষরংয/ছখ এ্রবসঢ়ষধঃব.ঢ়যঢ়? চধৎধসব-ঃবৎথছখঝঈধঃথওউ=৫৫ইুউধঃব=ণবধৎ=.

৯ 'নির্বাচনে দেশজুড়ে নারী প্রার্থী', নারী মঞ্চ, *প্রথম আলো*, ২৪ ডিসেম্বর ২০০৮।

১০ সাখাওয়াত লিটন, 'উইমেন রিজার্ভ সিট ইন লোকাল গভ. গভর্নমেন্ট রিট্রিট ফ্রম প্লিজ', *দি ডেইলি স্টার*, ১২ মে ২০০৮।

১১ *প্রাগুক্ত।*

১২ *প্রাগুক্ত।*

ক্ষেত্রে এই পূর্বশর্ত দিয়ে জনপ্রতিনিধিত্ব অধ্যাদেশ ১৯৭২ সংশোধিত হয়েছে।

ভোটার নিবন্ধন তথ্যে লিঙ্গীয় বৈষম্য

জাতীয় সংসদ নির্বাচন ২০০৮-এর ভোটার নিবন্ধনের মাধ্যমে প্রদত্ত জাতীয় পরিচয়পত্রে লিঙ্গীয় বৈষম্যের উপস্থিতি নারী অধিকার সচেতন ব্যক্তিবর্গের মধ্যে সমালোচনার জন্ম দেয়।[১৩] যদিও সবধরনের অফিসিয়াল কাগজপত্রে ব্যক্তির নাম প্রদানের সময় পিতার পাশাপাশি মাতার নাম লেখার বিষয়ে নারী উন্নয়ন নীতিতে বলা হয়েছে,[১৪] কিন্তু নির্বাচন কমিশন এই সরকারি নীতিমালা পালন না করে বিবাহিত নারী ভোটারদের পরিচয় তাদের স্বামীর মাধ্যমে নির্ধারণ করে দিয়েছে।[১৫] কিন্তু বিবাহিত পুরুষদের পরিচয়পত্রে স্ত্রীর পরিচয় অন্তর্ভুক্ত করার এই নিয়ম আরোপ করা হয়নি।

বিয়ের ক্ষেত্রে পছন্দ করার স্বাধীনতা

নারীর স্বতন্ত্র পরিচিতি এবং পছন্দ করার ও চলাফেরার স্বাধীনতার ক্ষেত্রে আইন ও সালিশ কেন্দ্রের হাইকোর্টে দায়ের করা রিট আবেদন এবং মানবাধিকার আইনজীবীদের মিলিত প্রচেষ্টার ফলে উৎসাহব্যঞ্জক অগ্রগতি হয়েছে। ১৪ ডিসেম্বর হাইকোর্ট লন্ডন প্রবাসী ডা. হুমায়রা আবেদিনকে (বয়স ৩২) মুক্তির নির্দেশ দেন। ড. হুমায়রা 'মানসিকভাবে অসুস্থ' এবং 'অবিবাহিত' বিধায় তার বাবা-মাই তার হেফাজতের অধিকারী এই বলে তাকে ঢাকায় জোরপূর্বক আটকে রাখা এবং ভিন্ন ধর্মের হওয়ায় হুমায়রার পছন্দের ব্যক্তির সাথে মেলামেশায় বাধা দেয়ার অভিযোগ আনা হয় হুমায়রার বাবা-মার বিরুদ্ধে। হাইকোর্ট হুমায়রাকে বাংলাদেশস্থ ব্রিটিশ হাইকমিশনে পৌঁছে দেয়ার জন্য পুলিশ কমিশনারের প্রতি নির্দেশ দেন। আদালত হুমায়রাকে নিরাপদে লন্ডন পৌঁছবার সব ব্যবস্থা করতে ব্রিটিশ হাইকমিশনকে অনুরোধ জানান।

নারীর প্রতি সহিংসতা

---

১৩ শামীমা নাসরিন, 'জেন্ডার বায়াস ইন ন্যাশনাল আইডেনটিটি (আইডি) কার্ড', *দি ডেইলি স্টার*, ৮ জানুয়ারি ২০০৮।

১৪ নারী উন্নয়ন নীতি ২০০৮, তৃতীয় অধ্যায়, ধারা-৩.৯।

১৫ হামিদা হোসেন, 'নারীনীতি : সমস্যাটি কোথায়?', *প্রথম আলো*, ১০ এপ্রিল ২০০৮।

সরকারের কাছে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন কর্তৃক উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য একটি যৌন নিপীড়নবিরোধী নীতিমালা জমা দেয় এবং নারী ও মানবাধিকার সংগঠনের পক্ষ থেকে সম্মিলিতভাবে সরকারের কাছে প্রস্তাবিত পারিবারিক নির্যাতনবিরোধী আইনের খসড়া উপস্থাপন করা হয়, যা ছিল এই দুটি বিষয়ে দীর্ঘদিনের আলাপ-আলোচনা ও প্রচারের ফলে সাধিত গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি।

জাহাঙ্গীরনগর ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরপর যৌন নিপীড়নের ঘটনা ঘটলে ছাত্রছাত্রীরা আমরণ অনশনের মতো প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করে; কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এ ঘটনায় কার্যকর পদক্ষেপ না নেয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ে যৌন নিপীড়নবিরোধী নীতিমালা প্রণয়ন ও অভিযোগ সেল গঠনের জন্য ছাত্রী-ছাত্র, শিক্ষক, নারী সংগঠন এবং নাগরিক সমাজের দীর্ঘদিনের দাবিটি প্রবলভাবে সামনে চলে আসে। আগস্টে বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতির একটি রিট আবেদনের প্রেক্ষিতে হাইকোর্ট অফিস-আদালতসহ বিভিন্ন কর্মক্ষেত্র ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যৌন হয়রানি বন্ধের জন্য কেন নতুন আইন বা বিধিমালা প্রণয়ন করার নির্দেশ প্রদান করা হবে না– মর্মে সরকারের প্রতি একটি রুল জারি করেন। অন্যদিকে নভেম্বরে অন্য আরেকটি রিট আবেদনের প্রেক্ষিতে হাইকোর্ট জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে যৌন নিপীড়নের অভিযোগে অভিযুক্ত নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগের শিক্ষক সানোয়ার হোসেন সানির অব্যাহতিদানের সিন্ডিকেটের আদেশকে কেন অবৈধ ঘোষণা করা হবে না এবং ছয় শিক্ষার্থীর, যাদের চারজন সরাসরি ওই শিক্ষকের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনে এবং দু'জন তার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য-প্রমাণ হাজির করে, তাদের বহিষ্কারাদেশ কেন আইনগত কর্তৃত্ব-বহির্ভূত ঘোষণা করা হবে না– এর কারণ দর্শাতে বলে। আদালত ছাত্রছাত্রীদের বিরুদ্ধে সিন্ডিকেটের বহিষ্কারাদেশ স্থগিতেরও ঘোষণা দেন।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন নীতিমালার খসড়া তৈরির জন্য ১৬ সদস্যের একটি জাতীয় কমিটি গঠন করে এবং ১৩ নভেম্বর খসড়া নীতিমালা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে জমা দেয়ার আগে শিক্ষাবিদ, বিশিষ্ট নাগরিকসহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে আলোচনা করে ও পরামর্শ নেয়। মঞ্জুরি কমিশনের এ উদ্যোগ প্রশংসনীয় হিসেবে বিবেচিত হয়। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত এ নীতিমালা গৃহীত হয়নি।

৩০ জুন নারী ও মানবাধিকার নিয়ে কাজ করে এমন ৪০টি সংগঠন একত্রিতভাবে নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে 'পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ আইন'-এর একটি খসড়া জমা দেয়। প্রস্তাবিত আইনে উল্লেখযোগ্য

যে বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তা হলো– পারিবারিক সহিংসতার একটি সমন্বিত সংজ্ঞা, সুরক্ষা আদেশের বিধান, বৈবাহিক সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তির স্বীকৃতি এবং বিবাহ-পরবর্তীকালে বসবাসরত বাড়ির ওপর অধিকার প্রদান। সরকার এখন পর্যন্ত প্রস্তাবনা বাস্তবায়নের জন্য কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি।

নারীদের প্রতিবাদ-সমাবেশ

পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের ভিত্তিতে আসকের তৈরি নারীর প্রতি সহিংসতার পরিসংখ্যান থেকে এসিড আক্রমণ এবং ফতোয়ার ঘটনা কিছুটা কমতে দেখা যায়। অন্যদিকে ধর্ষণ, পারিবারিক নির্যাতন এবং গৃহপরিচারিকা নির্যাতনের ঘটনা বাড়তে দেখা যায়। অবশ্য এ ধরনের পরিসংখ্যান থেকে নির্যাতনের ধরন সম্পর্কে একটি সংখ্যাগত চিত্র পাওয়া যায়। কিন্তু এর পরিধি এবং মাত্রা সম্পর্কে জানা সম্ভব হয় না।

সারণি : ১৪.১ ২০০৪ থেকে ২০০৮-এর মধ্যে নারীর প্রতি সহিংসতার তুলনামূলক তথ্য[১৬]

নির্যাতনের ধরন	২০০৪	২০০৫	২০০৬	২০০৭	২০০৮

১৬ আসক তথ্য সংরক্ষণ ইউনিট।

এসিড আক্রমণ	২২৮	১৩০	১৪২	৯৫	৮০
পারিবারিক নির্যাতন	৬১৬	৬৮৯	৬৩৫	৫৭৭	৬০৮
(যৌতুকের কারণে)	(৩৫২)	(৩৫৬)	(৩৩৪)	(২৯৪)	(২৯৬)
ধর্ষণ	৬১৮	৫৮৫	৫১৫	৪৩৬	৪৮৬
(গণধর্ষণ)	(৩৯৫)	(২৫০)	(২২৬)	(১৯৮)	(১২৭)
গৃহপরিচারিকা	৮৩	১১৫	১০৭	৮৩	১১০
নির্যাতন	৩৫	৪৬	৩৯	৩৫	২০
ফতোয়া					

প্রতিবেদন অনুসারে ২০০৭ সালে ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছিল ৪৩৬টি, ২০০৮ সালে তা আরও বেড়েছে, হয়েছে ৪৮৬টি। এর মধ্যে চারটি ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে পুলিশ কর্তৃক। যৌতুকের কারণে ২০০৮ সালে নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে ২৯৬টি, তার আগের বছর যৌতুককেন্দ্রিক নির্যাতনের ঘটনা ছিল ২৯৪টি।

সারণি : ১৪.২: ২০০৮ সালে ধর্ষণের ঘটনা[১৭]

বয়স / নির্যাতনের ধরন	৬ বছরের নিচে	৭-১২	১৩-১৮	১৯-২৪	২৫-৩০	৩০+	বয়স উল্লেখ নেই	মোট
ধর্ষণের চেষ্টা		৪	৩	২	৪		২৩	৩৬
ধর্ষণ	১৭	৫৬	৩৮	১১	৪	৬	৭৩	২০৫
গণধর্ষণ		৯	১৮	১৬	১০	১	৭৩	১২৭
ধর্ষণকারী সম্পর্কে উল্লেখ নেই	১	৮	১১	২	৫	৩	৮৮	১১৮
মোট	**১৮**	**৭৭**	**৭০**	**৩১**	**২৩**	**১০**	**২৫৭**	**৪৮৬**
হত্যা	১	১১	১৭	৯	৬	৪	৩৫	
আত্মহত্যা			৩	২	২		১	

২০০৮ সালে সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদ অনুযায়ী ফতোয়ার ঘটনা ঘটে ২০টি, অপরদিকে ২০০৭ সালে ফতোয়ার ঘটনা ছিল ৩৫টি। ২০০৮ সালে গৃহপরিচারিকা নির্যাতনের ঘটনা বৃদ্ধি পায়, জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে ১০৮টি নির্যাতনের সংবাদ প্রকাশিত হয়, শারীরিক নির্যাতন থেকে ধর্ষণ এবং হত্যা রয়েছে এসব নির্যাতনের মধ্যে। তিনটি আত্মহত্যার ঘটনাও রয়েছে এর মধ্যে। এ প্রতিবেদন প্রকাশের সময় পর্যন্ত এসব ঘটনার বিরুদ্ধে

---

১৭ *প্রাগুক্ত।*

কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ বা ঘটনার তদন্ত করা হয়েছে বা এর সাথে জড়িত ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা পরিচালনা করা হচ্ছে এমন কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি।

সারণি : ১৪.৩ : ২০০৮ সালে গৃহপরিচারিকা নির্যাতনের ঘটনা[১৮]

বয়স / নির্যাতনের ধরন	৬ বছরের নিচে	৭-১২	১৩-১৮	১৯-২৪	২৫-৩০	৩০+	বয়স উল্লেখ নেই	মোট
শারীরিক নির্যাতন	১	৯	১৬		৩	১	৮	**৩৮**
ধর্ষণ/ধর্ষণের চেষ্টা		৩	১				৭	**১১**
নির্যাতনের ধরন উল্লেখ নেই(মৃত্যু)		৫	১৭	১১	৪	১	৪	**৪২**
আত্মহত্যা		১	১				১	**৩**
শারীরিক নির্যাতন পরে মৃত্যু		৪	৬	২		১	২	১৫
মোট	**১**	**২২**	**৪১**	**১৩**	**৭**	**৩**	**২২**	**১০৯**

১৮ *প্রাগুক্ত।*